দেশভাগঃ স্মৃতিকথায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান

সারসংক্ষেপ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধির
শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দেবযানী সেনগুপ্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ সৌমিত্র বসু

প্রাক্তন অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে ইংরেজদের অনুসরণে ভারতবর্ষের ইংরেজি শিক্ষিত এলিট সম্প্রদায় জাতির যে একমাত্রিক সমসত্ত্ব ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, বিশ শতকে এসে সেই ধারণা প্রবল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বিশ শতকে প্রতিযোগিতামূলক ভোটের রাজনীতি বাংলা তথা ভারতের বুকে হিন্দু, মুসলমান এবং দলিতদের আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে প্রবল করে তুলেছিল। ভারতের প্রধান দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতায়নের প্রতিযোগিতাই ছিল এই রাজনীতির মৌলিক ভিত্তি এবং তার পরিণতিতেই ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয় ধর্মের ভিত্তিতে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভাষার ভিত্তিতে পুনরায় বিভাজিত হয় — জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হিংসার আবহে ১৯৪৭ সালে যে দেশভাগ সংঘটিত হ'ল, তার একমাত্রিক বয়ান রচনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী উপর দেশভাগের অভিঘাত স্বতন্ত্র। তাঁরা তাঁদের প্রেক্ষিত থেকে দেশভাগকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে মনে রাখতে চেয়েছেন। একথা ঠিক দেশভাগের অব্যবহিত পরের দুই দশকে সীমারেখার উভয়প্রান্তের বাঙালি মানস দেশভাগ নিয়ে একপ্রকার নীরবতা পালন করেছে। কিন্তু পাকিস্তান বিভাজিত হয়ে বাংলা ভাষা ভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত হওয়া মাত্র পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি দেশভাগকে বিশেষভাবে তুলে আনতে চেয়েছে কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে। ক্রমশঃ দেশভাগের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত স্মৃতির উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে — এমনকি অধুনা বাংলাদেশেও। স্মৃতি অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নয়। স্মৃতি এইকারণে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ স্মৃতির অন্তরালে অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে একধরনের নির্বাচন ও নির্মাণ সক্রিয় থাকে। বস্তুতঃ দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতিচারণাগুলির পিছনে সক্রিয় আছে স্মরণকর্তার নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। সুতরাং দেশভাগের স্মৃতির বয়ানগুলি কোন সমসত্ত্ব মহাআখ্যান রচনা করতে পারে না, পরন্তু আধিপত্যবাদী আখ্যানকে ভেঙে দিতে চায়। শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, পেশা অথবা রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী দেশভাগের স্মৃতির বয়ান বিভিন্ন, জটিল এবং অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। স্মরণকর্তার বিশিষ্ট সত্তাপরিচয়টি তাঁর স্মৃতির বয়ানকে, প্রকরণকে এবং ভাষাভঙ্গিমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ দেশভাগের ব্যক্তিগত স্মৃতির বয়ানগুলিতে নিরপেক্ষতা ও অনিরপেক্ষতার

ভারসাম্য অথবা ভারসাম্যহীনতা প্রতিফলিত হয়েছে এবং ব্যক্তিকে ছাপিয়ে তা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে আভাসিত করে তুলেছে। এই গবেষণাটিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতিকেও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। বস্তুতঃ দেশভাগ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে সব থেকে বড় মানবিক দুর্ঘটনা। অপরপক্ষে বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেই দেশবিভাজন জাতিসত্তা আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার অনুঘটক ঘটনামাত্র। আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতিও সমসত্ত্ব নয়। পূর্ববাংলার স্মৃতিকথাতেও বিভিন্ন স্বর ধরা পড়েছে। এই গবেষণাপত্রে ভারতের পূর্বপ্রান্তের দেশভাগকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক স্মৃতি ও স্মৃতিতে আত্মপরিচয়ের প্রকাশ ও সংকটকে সমস্যায়িত করা হয়েছে। আটের দশকে ঐতিহাসিক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র-ইতিহাসের বয়ানের পাশাপাশি দেশভাগের বহুমাত্রিক বয়ান নির্মাণের জন্য স্মৃতি সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে স্মৃতি সংগ্রহের মাধ্যমে দেশভাগ, সত্তাপরিচয় ও তার সংকটকে বিভিন্ন পরিসরে দেখতে চাওয়া এবং সেই অনুযায়ী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়ে গেছে। পূর্বপ্রান্তে সেই তুলনায় দেশভাগের স্মৃতিকেন্দ্রিক চর্চা ও তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার কাজ খুবই কম। আলোচ্য গবেষণাপত্রে স্মৃতিকথার মাধ্যমে ব্যক্তির তথা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দেশভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, সংগ্রাম ও প্রাপ্তি, হারানোর বেদনা অথবা নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তোলার ভিন্ন ভিন্ন কাহিনিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। স্মরণকর্তার বিশিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী তাঁর স্মৃতির বয়ানে দেশ, জাতীয়তাবাদ, উদ্বাস্তু জীবন, আত্মপরিচয় অথবা তার সংকটের অভিব্যক্তিগুলি কেমনভাবে ধরা পড়েছে তা গবেষণাকর্মটিতে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এইভাবে আলোচনাকে সাজাতে গিয়ে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে বিভাজন করা হয়েছে ঃ—

১) বাংলা বিভাজন ও আত্মসত্তার রাজনীতি ঃ একটি বিধ্বস্ত সময়ের আখ্যান — বিশ শতকের প্রথমে বঙ্গদেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল, বাংলার মুসলিম জনস্রোত তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল ক্রমশঃ। বস্তুতঃ ওই সময়ে বাংলার ভূমিতে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়েছিল — যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে

ক্রমশঃ হিন্দু আধিপত্যের বিরোধিতা শুরু করে, হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির একটি প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের প্রথম বঙ্গবিভাজনকে কেন্দ্র করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর — বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে মতবিরোধ প্রবলভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ তৈরী করেছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালির ঐক্যের গল্প শোনালেও, বাস্তবে পূর্ববাংলার মুসলিম গোষ্ঠী ছিলেন বাংলাভাগের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সামাজিক বিভেদের কারণ অনুসন্ধান করে তাঁর বিভিন্ন, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে — যে আন্দোলন পূর্ববাংলার মুসলমানদের স্বার্থ ও ক্ষোভকে কোনরকম মূল্য দিতে অপারগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবার্তা সচেতন করতে পারেনি হিন্দুত্ববাদী স্বার্থবোধকে। সুতরাং সামাজিক ফাটল ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে উঠেছে এবং এইভাবেই দুই সম্প্রদায়ের আত্মসত্তার রাজনীতি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কলকাতাতে মুসলমান গোষ্ঠী পার্কসার্কাসে সভা করে ১৯০৬ সালে, স্বদেশিদের অত্যাচারের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সংগঠন তৈরি হয়, 'লাল ইশতেহার' পত্রিকায় প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুদের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে মুসলমান সমাজ। ১৯০৭ সালে কুমিল্লা শহরে এবং ১৯২৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ বুঝে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার স্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয়। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় বাংলার হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণিও একইভাবে প্রবল সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করে।

অন্যদিকে পূর্ববাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজাপার্টি জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। যেহেতু পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিল কৃষক এবং হিন্দুরা জমিদার — সেই হেতু ফজলুল হকের নেতৃত্বে শ্রেণি সংঘর্ষ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক রূপ পায় এবং এই পার্টির সমর্থনে জড়ো হয় মুসলমান জোতদার শ্রেণি — যারা গ্রামীণ পূর্ববাংলার নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালে এই পার্টির নেতা ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সীর সরকার গঠন করেন এবং একই সঙ্গে বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করা

শুরু করে। অন্যদিকে হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণিও প্রবল সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বাংলায় হিন্দুমহাসভার সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

বাংলার বুদ্ধিজীবীরাও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি। মীর মুশারফ হোসেন থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — এঁদের সৃষ্টিকার্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁদের সাম্প্রদায়িক অবস্থান। হিন্দু বাঙালির লেখায়, মননে মুসলমান রাজত্ব ও মুসলমান চরিত্র সম্পর্কে এক নেতিবাদী ধাঁচা তৈরী হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় তার প্রমাণ মেলে। অন্যদিকে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানগোষ্ঠী আত্মসত্তার পরিচয়কে স্বতন্ত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হিন্দুর পরিধেয় ধুতি ত্যাগ করে স্বতন্ত্র 'মুসলমানি' পোশাক নির্বাচন করে, নির্মাণ করা শুরু করে মুসলমানদের নিজস্ব ভাষার, শিক্ষাপদ্ধতির ও বীরত্ব গাথামূলক ইতিহাসের।

এইসময় হিন্দুমহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মুসলমানদের ক্ষমতায়নকে রোধ করার জন্য নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের বৃহত্তর হিন্দুজাতির অংশ হিসেবে ঘোষণা করলেও, ১৯৪২ সালে তফসিলি সংগঠন ঘোষণা করে দলিতরা হিন্দুদের থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট। পরবর্তীকালে নিম্নবর্ণীয় নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডলের রাজনৈতিক অবস্থান প্রমাণ করে, হিন্দু-মুসলমানের প্রতিযোগিতামূলক আত্মসত্তার রাজনীতিতে বাংলায় নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

একথা ঠিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সামাজিক এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে শাসন ও শোষণ চালিয়েছিল অবলীলাক্রমে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না, দেশবিভাজন শুধুমাত্র তাদেরই ষড়যন্ত্র নয়, বাংলা তথা ভারতের গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রতিযোগিতা দেশভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। সুতরাং এই কারণেই দেশভাগের প্রতিক্রিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু, অধুনা বাংলাদেশের মুসলমানদের ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একইরকম নয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের আত্মসত্তা রাজনীতির এই আখ্যানকে না জানলে দেশভাগের পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের স্মৃতিচারণার বিশেষ বিশেষ অবস্থানটিকে যথাযথভাবে বোঝা যাবে না।

২) স্মৃতি, সত্তা, সত্য ঃ — 'স্মৃতি' কি এবং কিভাবে সক্রিয় হয়, স্মৃতি কি আর্কাইভ, স্মৃতি থেকে কি ইতিহাস রচনা সম্ভব — স্মৃতি কেন্দ্রিক এই সকল বিবিধ প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত স্মৃতি ও

ইতিহাসের সম্পর্কটি। এই সম্পর্ক নির্ণয় করা স্মৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কারণ ইতিহাসবিদ্‌রাও দেশভাগের অভিঘাতের ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে স্মৃতিকথার উপর অনেকখানিই নির্ভর করেন। দেশভাগের স্মৃতিকথার পিছনে সক্রিয় থাকে গোষ্ঠীগত অভিপ্রায়, সুতরাং 'স্মৃতি' কিভাবে দেশভাগের ইতিহাস রচনার উপাদান হতে পারে — এই প্রশ্ন অমূলক নয়। ব্যক্তির স্মৃতি যখন ভাষায় প্রকাশ পায়, তখন উপস্থাপনার বিশেষ ভঙ্গিটিও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানটিকে নির্ধারণ করে। স্মৃতির সঙ্গে অন্বিত থাকে আরও দুটি শব্দ — 'মনে করা' (remembering) ও ভুলে 'যাওয়া' (forgetting)। দুটি ক্রিয়াই আকস্মিক নয়। বস্তুতঃ দেশভাগের মত রাজনৈতিক সমস্যা ও মানবিক দুর্বিপাকের ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কে কতটা মনে রাখছেন ও কতটা ভুলে যেতে চাইছেন - সবটাই নির্ভর করে ব্যক্তির গোষ্ঠীগত সত্তা পরিচয়ের উপর। সত্য তো এক ও চরম নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সত্যের নানামুখের সন্ধান পাওয়া যায়। যে কোন একটি ঘটনা — যেমন ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা, যেটি দেশভাগকে তরান্বিত করেছিল — সেই ঘটনাটিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ কত বিচিত্র ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন — সেই আলোচনা উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে। এই দাঙ্গার দায়বদ্ধতা স্বীকারের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রদায়গত পার্থক্য — এমনকি বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতির ভাষ্যেও — বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার রাজনৈতিক আদর্শবোধের কারণে তপন রায়চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য থেকে যায়। বস্তুতঃ ইতিহাসও তো শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ নয়, ইতিহাসও হ'ল অতীতের উপস্থাপনা। সুতরাং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা থাকে। আধুনিক ইতিহাসচর্চাও হয়ে উঠেছে — "from the concrete message to its subjective representation"[1]। এইভাবে দেখলে ইতিহাস ও স্মৃতিকথার ভিতর একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। সুতরাং দেশভাগের স্মৃতিকথার বহু মাত্রিকতা যে কোনভাবেই ইতিহাসবোধকে নাকচ করে না — সেই বিষয়টিই এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৩) বিষাদ ও বঞ্চনার স্মৃতি ঃ— ভারতের ইতিহাস দেশভাগকে চিহ্নিত করেছে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে। পশ্চিমবাংলায় যাঁরা ঘটিপুরুষ ছিলেন — যেমন অন্নদাশংকর রায়, অথবা যে সব

উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন — সাধারণভাবে তাঁদের দেশবিভাজন সংক্রান্ত স্মৃতিচারণায় বিষাদের সুর। যদিও পশ্চিমবঙ্গীয় অন্নদাশংকরের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মিহির সেনগুপ্ত প্রমুখ উচ্চবর্ণীয়দের দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতিচারণার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। কারণ মিহির সেনগুপ্ত প্রমুখরা দেশভাগের ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির স্মৃতির অ-নিরপেক্ষতার ভঙ্গিটি উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ লক্ষণ। যদিও অন্নদাশংকরের পূর্ববাংলার প্রতি যে অপরতারবোধ, মিহির সেনগুপ্তদের স্মৃতিকথায় তা থাকা সম্ভব নয়। পরন্তু আজন্ম পরিচিত অঞ্চল ছেড়ে এলেও দেশ-জেলার প্রতি সংলগ্নতার নিবিড় আবেগ তাদের স্মৃতিকে নস্টালজিক করে তুলেছে। অন্যদিকে ভূমির উপর অধিকারের প্রশ্নে মিহির সেনগুপ্তর বক্তব্য আপাতঃ ভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা করলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর স্বর পূর্ববঙ্গীয় প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে জমির অধিকারী-গোষ্ঠী হিন্দুবর্গীয়দের স্বপক্ষেই কখনও কখনও অনুরণিত হয়েছে। এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট দ্বিচারিতা তাঁর স্মৃতিকথায় লক্ষণীয়, প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ হিন্দু উচ্চবর্গীয়দের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আত্মসত্তার রাজনীতিতে তালুকদার পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি জমিহারা উদ্বাস্তু — ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। মিহির সেনগুপ্তর এই দ্বন্দ্বটুকুও প্রকাশ পায়নি গোপালচন্দ্র মৌলিকের স্মৃতিকথায়। তাঁর স্মৃতিকথার বর্ণনায় শিল্পের ভাষাতে সুচতুর ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দুত্ববাদের পবিত্রতার ভাষাকে।

ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী অবশ্য তাঁর গান্ধীবাদী রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা অনিরপেক্ষতাকে অনেকখানিই অতিক্রম করে নিজের আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে চেয়েছেন 'আধুনিক উদার মানুষ হিসেবে। তথাপি মুসলমানদের আত্মসত্তার রাজনীতির প্রতি তাঁর অসমর্থনের বিষয়টিও তাঁর বয়ানে গোপন থাকেনি। হিন্দু শিক্ষিত বাঙালি ও মুসলমান শিক্ষিত বাঙালির সেই সময়কালীন চিন্তাচেতনার দূরত্ব এইভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে মার্ক্সবাদী নেতা অশোক মিত্রর স্মৃতির বয়ানে দেশভাগকে নাকচ করার স্পষ্ট মনোভাব ধরা পড়ে — কারণ মার্ক্সবাদীরা দেশভাগকে নিয়ে আতিশয্যকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিবেচনায়। দেশভাগের পূর্বে মুসলমান চাষী ও হিন্দু জমিদারের সংঘর্ষ দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শ্রেণিশোষণের

বিরুদ্ধে বিপ্লবী মনোভাবের প্রাথমিক শিক্ষা বলে তিনি মনে করেছেন।

অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের দেশভাগের স্মৃতিতে বিষাদের সঙ্গে এসেছে যন্ত্রণা ও ক্ষোভ, এমনকি ক্রোধও। নিম্নবর্গীয় নিম্নবর্ণীয় ক্যাম্পনিবাসী হিন্দু অথবা দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের স্মৃতিতে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্ধগলিগুলি নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উত্থাপিত হয়েছে। মনোরঞ্জন ব্যাপারী প্রমুখ দলিত লেখকদের স্মৃতিকথায় দেখবো তাদের সংগ্রাম ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে, — নাগরিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে। তাঁদের ক্রোধের উদ্দিষ্ট উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা। তাঁদের স্মৃতিতে ছেড়ে আসা দেশের নস্টালজিক আবেগের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে এদেশে এসে শিয়ালদহ স্টেশন, ক্যাম্প অথবা দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি স্থানে দিনযাপনের নির্মমতার কাহিনি।

দেশভাগ ও নারী এক বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু দেশভাগের ক্ষেত্রে পুরুষের স্মৃতি অথবা ছোটগল্প-উপন্যাস নারীর যে অবস্থান তৈরী করেছে, তা মূলতঃ একপেশে ও পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব সঞ্জাত। এইকারণেই নারীর নিজস্ব স্মৃতিচারণার বয়ানকে বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। মণিকুন্তলা সেন, সুনন্দা সিকদার অথবা নীলিমা দত্তর মতো নারীদের স্মৃতির বয়ানে দেখি নারীর দেহকে আক্রান্ত হিসেবে বর্ণনা করার প্রথাসিদ্ধ বয়ানকে ভেঙে দেওয়ার প্রয়াস। তাঁদের স্মৃতির বয়ানে নারী শুধুমাত্র বিষয় হয়ে থাকেনি, বিষয়ী হয়ে উঠেছে। দাঙ্গায় সহিংস অংশগ্রহণ অথবা উদ্বাস্তু জীবনে কলোনি স্থাপন ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা — সকল ক্ষেত্রেই দেখব নারীর সক্রিয় ভূমিকা। এইভাবেই দেশভাগকে কেন্দ্র করে নারীর নিজস্ব স্বর স্মৃতিকথাতে ভিন্নতার ভঙ্গি নিয়ে এসেছে। নারী জীবনে দেশভাগের ইতিবাচক প্রভাবের কথা শুনি মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতিকথায়। পুরাতন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভেঙে ফেলে উদ্বাস্তু নারীদের বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে এসে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছেন মণিকুন্তলা। আবার মিহির সেনগুপ্তর স্মৃতিতে পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘু জীবনের যে তিক্ততার প্রকাশ, সুনন্দার স্মৃতিতে সেখানে সমন্বয়ী আবেগ ক্রিয়াশীল। এইভাবে এই অধ্যায়টিতে অধুনা পশ্চিমবঙ্গবাসীর দেশভাগজনিত বহুমাত্রিক স্মৃতিচারণাকে আলোচনা কেন্দ্রে তুলে আনা হয়েছে।

৪) আত্মসচেতন আত্মনির্মাণের স্মৃতি ঃ— এই অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে

পূর্বপাকিস্তান অথবা অধুনা বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতিতে দেশভাগের হেতু ও অভিঘাত কেমনভাবে ধরা পড়েছে সেই প্রসঙ্গ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মুহূর্ত বৃহত্তর বাঙালি মুসলমান সমাজের কাছে ছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দুর আধিপত্য থেকে মুক্তির লগ্ন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে দেশভাগ-পূর্ববর্তী সময়ে মুসলমান বাঙালির আত্মসত্তার রাজনীতির তথ্যনিষ্ঠ বয়ান তৈরী করেছেন। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক। দেশভাগ-পূর্ব মুসলিম লীগ রাজনীতি এবং ১৯৪৬ সালের ভয়ংকর কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে মুসলিম মানসের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া যেমন ধরা পড়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়, তেমনই দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমানের স্বপ্নভঙ্গ ও পাকিস্তানী শাসকদের বিরোধিতায় বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণের অঙ্গীকার ও আন্দোলনের মুহূর্তগুলিও তাঁর স্মৃতিকথায় ভাস্বর। দেশভাগের পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তাঁর প্রতিপক্ষ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগের পরে তা পরিবর্তিত হয়ে প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে পাকিস্তানী শাসকের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণনীতি। দেশভাগের পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে ছিলেন মুসলমান বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ। সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও মুসলমান বাঙালির আত্মসত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের সাংস্কৃতিক উদ্যোগের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক আবু রুশ্‌দ্‌ তাঁর স্মৃতিকথাতে। আবার পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার নাগরিক মানসিকতার মুসলমান বুদ্ধিজীবী বাঙালির অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পূর্ববাংলায় গিয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকীত্বের যন্ত্রণা ধরা পড়েছে লেখক আবুল হোসেনের স্মৃতিচারণায়। গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গীয় মধ্যবিত্ত মুসলমান — তাঁদের বিমিশ্র মনোভাব স্মৃতিকথার ভাষ্যে দেখা যায়। একদল উচ্চাকাঙ্খী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান যুবক হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির শিক্ষা ও চাকরি জগতে ফেলে আসা শূন্যস্থান গ্রহণ করে উন্নতির আশায় চলে গেলেন মুসলমানদের নিজস্ব দেশ পূর্বপাকিস্তানে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম পশ্চিমবাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সম্পত্তি হারিয়ে। তাঁর পুত্র বাংলাদেশের বিখ্যাত কম্যুনিস্ট ঐতিহাসিক বদরুদ্দিন উমরের স্মৃতিচারণায় সেই আক্রমণ ও প্রবঞ্চণার তীব্র অভিঘাত ধরা পড়েছে। শামসুর রাহমানের মত মানবপ্রেমী কবি — যিনি ঢাকা শহরে

বড় হয়েছেন, পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নীরবতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ও আবুল হোসেনের স্মৃতিকথায় নবসৃষ্ট রাষ্ট্রে কলকাতার সমান্তরাল বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা শহরের গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত ধরা পড়ে।

রাজনৈতিক ব্যক্তি, সাংবাদিক অথবা সাহিত্যিক — সব বর্গের মুসলমান বাঙালির স্মৃতিকথায় অপমানের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা জনিত বাছবিচারের ব্যক্তিগত স্মৃতি। মুসলমান বাঙালির আত্মসত্তা নির্মাণের প্রসঙ্গে তাঁদের এইপ্রকার স্মৃতি হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক দূরত্বের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে। অথচ হিন্দু বাঙালি — বিশেষত উচ্চবর্ণীয় হিন্দু বাঙালির স্মৃতি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সেই সামাজিক দূরত্বকে অস্বীকার করে বারংবার প্রমাণ করতে চেয়েছে দেশবিভাজন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের সহৃদয়তার সম্পর্ক ছিল।

দেশভাগ জনিত কারণে ভগ্নপরিবারের যন্ত্রণার কথা এবং শেকড়হীনতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে স্বল্প কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু মুসলমান বাঙালির স্মৃতিচারণায়। লেখক হাসান আজিজুল হক তাঁর সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশভাগের সমালোচনা করেছেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের ভালবাসা ও ঘৃণার সম্পর্কের কথার উল্লেখ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। অথচ তাঁর স্মৃতিকথাতেই প্রকট হয়ে উঠেছে দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের 'ট্রমা' অথবা আতঙ্কের কথাও। বস্তুতঃ ভয়, আতঙ্ক উভয় বঙ্গ থেকে বিতাড়িত মানুষের একটি সাধারণ লক্ষণ। অতি তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতিকথা পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘু দীনেশচন্দ্র দেবনাথ রচিত গ্রন্থটি। বস্তুতঃ এপারের নিম্নবর্ণীয় ও ওপারে থেকে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় — এঁদের অস্তিত্ব সংকট প্রমাণ করে দেশভাগের অভিঘাতের তীব্রতা ও মর্মান্তিকতাকে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে বাঙালির আত্মসত্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্মৃতি ধরা পড়েছে সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিচারণায়। সন্‌জীদার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শাশ্বত বাঙালি সত্তা আবিষ্কারের আগ্রহ হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদকে লুপ্ত করে দিতে চেয়েছে। এইভাবে অধুনা বাংলাদেশের মানুষের দেশভাগ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়টিতে।

৫) স্মৃতি ও সৃজন ঃ— দেশভাগ কেন্দ্রিক বিভিন্ন স্মৃতিকথার কথনভঙ্গি আলোচনা করলে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না, দেশভাগের স্মৃতিকথা একটি নির্মাণ। স্মৃতিকথার

সঙ্গে কল্পনার সংযোগ থাকে, যদিও সে কল্পনার প্রসার দেশভাগ বিষয়ক গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। কিন্তু কথনভঙ্গির বিচারে বাংলা সাহিত্যের অনেক স্মৃতিকথা কাহিনি-কেন্দ্রিক সাহিত্যরূপের সমধর্মী হয়ে উঠতে চেয়েছে। দেশভাগের কিছু স্মৃতিকথা প্রবন্ধধর্মীতাকে আত্মস্থ করে সরাসরি ইতিহাসমূলক লেখা, কিছু লেখা ইতিহাসমূলক হয়েও কাহিনিধর্মী, প্রবন্ধ ও কাহিনিরূপের মিশ্রিত কথন এই স্মৃতিচারণাগুলির বৈশিষ্ট্য। আবার কোন কোন স্মৃতিচারণা নিছকই ব্যক্তিগত বয়ান। কিন্তু কমবেশি প্রায় সব স্মৃতিকথাগুলিতেই বাস্তব অভিজ্ঞতার চরিত্রগুলি সংলাপ ও অভিব্যক্তির বর্ণনায় জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আবার অন্যদিকে দেশভাগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গল্প-উপন্যাস শুধুমাত্র কল্পনার ফসল বলা যাবে না। কারণ দেশভাগ যাপিত জীবনে সংঘটিত একটি বাস্তব সত্য। যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, সেইসকল লেখকের স্মৃতি থেকেই সৃজনীকল্পনা গড়ে উঠেছে। স্মৃতিকথা ও কাহিনির বেড়া ভেঙে যাওয়ার উদাহরণ বুদ্ধদেব বসুর 'নোয়াখালি' নামক ছোটগল্পটি — যেটি স্মৃতিকথার প্যাটার্নে গড়ে উঠেছে। আবার যতীনবালার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা কথনরীতির বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠতে চেয়েছে ছোটগল্প।

আবার স্মৃতিকথার কথনও গোষ্ঠীভেদে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। মিহির সেনগুপ্তর স্মৃতিকথার আখ্যানে যুক্ত হয়েছে ইতিহাস বর্ণনার কৌশল ও সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ। দলিত লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিকথার কথনে অপভাষার ব্যবহার বঞ্চিত নিম্নবর্ণীয়দের ক্রোধকে প্রকাশ করেছে। যতীনবালার ভাষায় সেই শুষ্কতা না থাকলেও নিমর্মতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নির্মোহ। সুনন্দা সিকদারের দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়বাদী, আখ্যানগঠন ও কথন অনুভূতির নিবিড়তায় স্নিগ্ধ। ওপার বাংলার আবুল মনসুর আহমদের কথনে সাংবাদিক সুলভ ও আইনজীবীসুলভ যুক্তির প্রাধান্য ও নৈর্ব্যক্তিকতার ভাগ বেশি, তুলনায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণের ভাষা আবেগদীপ্ত। শামসুর রাহমান কথনভঙ্গিতে কবিসুলভ রোমান্টিক হলেও কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তা নন। এইভাবে ধর্মগত, লিঙ্গগত অথবা পেশাগত পরিচয় স্মৃতিকথার ভাষায় ও কথনে বহুরূপতাকে মূর্ত করে তুলেছে।

স্মৃতিকথার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দেশভাগকেন্দ্রিক বাংলা ছোটগল্প-উপন্যাসের অপর একটি সম্পর্ক-ও আছে। বস্তুতঃ উচ্চবর্ণীয়দের স্মৃতিকথা এবং দেশভাগকেন্দ্রিক মূল উপন্যাসগুলির

একটি সাযুজ্য হয়েছে। ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য বিষাদ, পূর্ববাংলার গ্রামের প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু চিহ্নের উল্লেখ, নারীসম্মানের অবমাননা — এসব কিছু মিলিয়ে উচ্চবর্গীয় আখ্যান কাঠামোর সম্প্রদায়গত অবস্থান সুস্পষ্ট। ক্যাম্পবাসী নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের কথা কিছু অপ্রধান উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও লেখকের স্বর সেখানে উচ্চবর্ণ ও প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে প্রকট হয়ে উঠেছে। আবার কিছু ছোটগল্প কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের প্রভাবে দেশভাগের উদ্বাস্তু সমস্যাকে শ্রেণিশোষণের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায়নি। ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছু ছোটগল্প বাস্তবের সামাজিক ভেদাভেদকে অস্বীকার করে কিছুটা কৃত্রিমভাবে অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্ণীয় মানুষের উপর দেশভাগজনিত অভিঘাত তাঁদের জীবনকে কিভাবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করেছিল — সেই কাহিনি ধরা পড়েছে কেবলমাত্র স্মৃতিকথাতে।

বাংলাদেশের উপন্যাস মূলতঃ মুসলমান বাঙালির আত্মআবিষ্কারের আখ্যান। পূর্ববাংলার উপন্যাস-ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ প্রাধান্য পেয়েছে বেশি, দেশভাগ তেমনভাবে নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি। আবুল মনসুর আহমদ প্রভৃতিদের স্মৃতিকথায় মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে যে সদর্থক ভঙ্গি, 'খোয়াবনামা' যেন তার সমালোচনা। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি মার্ক্সবাদী। আবার হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ। উল্লেখ্য, প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে লেখক একজন নারীকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস স্মৃতিকথার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশভাগ সমর্থনের মনোভাবকে বহুমাত্রিকভাবে ধরতে পারেনি। ধরতে পারেনি স্থানান্তরিত মুসলিম মানসের সত্তাপরিচয়ের সংকটকেও।

নারীর লেখা দেশভাগ বিষয়ক উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিবাদের সঙ্গে নারীর স্মৃতিকথার তুলনা এসে যায় স্বাভাবিকভাবেই। দুই ক্ষেত্রেই দেখবো নারীর স্বর নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। আবার নারীর প্রতিবাদের স্বরকে অসাধারণ দক্ষতায় উপন্যাস-দেহতে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন হাসান আজিজুল হক। দেশভাগে নারীর অবস্থান পিতৃতান্ত্রিকতা যেভাবে নির্ণয় করেছে উপন্যাস ও স্মৃতিকথা দুই-এ মিলে তার থেকে এক ভিন্নতর বাস্তবের ছবি অঙ্কণ করেছে।

এইভাবে স্মৃতিকথার সঙ্গে উপন্যাস-ছোটগল্পের তুলনা করলে উপন্যাস-ছোটগল্পের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। পশ্চিমবেঙ্গর দেশভাগ-বিষয়ক কাহিনি-শিল্পে দেশভাগের গল্প কিছুটা একমাত্রিক। কিন্তু স্মৃতিকথায় তা বহুমাত্রিক। বাংলাদেশের সাহিত্য দেশভাগ নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চায়নি। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিতে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী জায়গা করে নিয়েছে। বাংলাদেশের দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলিকে প্রাসঙ্গিক ও বিশিষ্ট করেছে বহুমাত্রিকতা। এই ব্যাপ্তি উপন্যাস-ছোটগল্পে নেই।

৬) ডায়াস্পোরা ও দেশভাগের স্মৃতিকথা ঃ— বিশ শতকের শেষ থেকেই 'ডায়াস্পোরা' অথবা অভিবাসন সমাজতত্ত্বের অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয়। 'ডায়াস্পোরা' জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন অভিবাসী মানুষের স্মৃতি ও সত্তাপরিচয়ের সংকট নিয়ে আলোচনা করে। অভিবাসী মানুষদের হাতেই গড়ে উঠেছে অভিবাসী সাহিত্য। দেশভাগের ফলে মানুষের স্থানান্তর-ও একধরনের ডায়াস্পোরা। যদিও বিতাড়িত এইসকল মানুষেরা স্বেচ্ছায় জন্মভূমি ত্যাগ করেননি, সুতরাং তাঁদের জন্মভূমি ত্যাগের বেদনা ও সত্তার সংকট, ভারত থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দেওয়া অভিবাসী মানুষদের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। সত্তাপরিচয়ের সংকট, বিচ্ছিন্নতার বোধ ইত্যাদি অভিবাসী চরিত্র লক্ষণ দেশভাগ বিষয়ক স্মৃতিকথায় আছে অবশ্যই। কিন্তু দুইপক্ষের অভিবাসী চেতনার অসংখ্য পার্থক্য-ও রয়েছে। দেশভাগের ফলে দেশত্যাগ হ'ল বিতাড়িত অভিবাসন বা victim diaspora। বিতাড়িত মানুষগুলির কাছে 'দেশ'-এর তাৎপর্য যেহেতু রাষ্ট্রধারণার থেকে স্বতন্ত্র, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতিতে তাদের ফেলে আসা জেলা অথবা গ্রামকে নিয়ে যে আবেগ তা ভারতীয় জাতীয়বাদের সমসত্ত্ব জাতি-ধারণার অসঙ্গতিগুলিকে চিহ্নিত করে। যদিও জেলা অথবা গ্রামকে কেন্দ্র করে তাদের যে নস্টালজিক আবেগ ও সংলগ্নতা স্মৃতির ভাষ্যে উঠে এসেছে, তা জাতীয়তাবাদী চেতনারই সমান্তরাল। সেই বিশেষ অঞ্চলের মানুষ হিসেবে এইসকল উদ্বাস্তুরা এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচিতির কথা বলে এবং এইভাবে উদ্বাস্তুদের 'দেশ' প্রেম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসঙ্গকে মূল্যবান করে তোলে। এই লক্ষণ যেমন দেখা গেছে মিহির সেনগুপ্তর স্মৃতির ভাষ্যতে,

তেমনই অভিবাসী লেখক অমিতাভ ঘোষের দেশভাগ নিয়ে লেখা উপন্যাস ''শ্যাডোলাইনস'' উপন্যাসের ঠাম্মার মনোভাবেও। পক্ষান্তরে ঝুম্পা লাহিড়ির ''নেমসেক'' উপন্যাসের অসীমার খন্ডিত সত্তার একটি সমঝোতার প্রয়াস উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি যা বিতাড়িত অভিবাসনের ক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা বাস্তুহারা। ছেড়ে আসা দেশ ও জীবনের সঙ্গে ওইরূপ সমঝোতা তাঁদের ক্ষেত্রে অসম্ভব।

অস্তিত্ব সংকটের স্বরূপ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমনভাবে ধরা পড়েছে, নিম্নবর্গীয় ক্যাম্পনিবাসী অথবা দন্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত মানুষদের সত্তাপরিচয়ের বিপর্যয়ের স্বরূপ তার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। কারণ নিম্নবর্ণীয় মানুষগুলির নাগরিকত্ব হারিয়ে গেছিল। ভারতরাষ্ট্রে নাগরিকতা অর্জনের জন্য তাঁদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ। তাঁদের অস্তিত্বের বিপর্যয়ের সঙ্গে অন্বিত তাদের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা। নাগরিকত্বের বিপর্যয় তাদের ন্যূনতম বেঁচে থাকার রসদটুকু থেকেও তাদের বঞ্চিত করতে চায়। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিতে তাই ক্রোধ, বঞ্চনার গ্লানি।

পূর্ববঙ্গ থেকে এপারে চলে আসার পর তপন রায়চৌধুরী ইংল্যান্ড-আমেরিকায় শিক্ষাবিদ্ হিসেবে বসতি স্থাপন করেন। অভিবাসী মানুষের শেকড়ের টান তাঁর স্মৃতির ভাষ্যে ধরা পড়ে দুইভাবে। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী ভারতীয় হিসেবে তাঁর রাষ্ট্রপরিচিতর স্থিতি ভারতীয় হিসেবে, আবার পৃথিবীব্যাপী তাঁর প্রব্রজনের কাহিনিকে 'বাঙালনামা' নামকরণ করে তিনি পূর্ববঙ্গের বরিশালের আত্মপরিচিতিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

অধুনা বাংলাদেশের কোন কোন মানুষের স্মৃতিকথায় শেকড়হীনতার বোধ প্রকাশ পেলেও সামগ্রিকভাবে আদর্শবোধের নতুন এক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে তাঁরা নতুন জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে চাইছিলেন। এই কারণে বিতাড়িত অভিবাসী চেতনার কেন্দ্রহীন, দিশাহারা অস্তিত্বসংকটকে তাঁরা নাকচ করতে চেয়েছেন। যদিও অবচেতনের গভীরে ফেলে আসা জন্মভিটার প্রতি সংলগ্নতাকেও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি বলেই তাঁদের অনেকের স্মৃতির ভাষ্যে একধরনের স্ববিরোধিতা আছে। দেশভাগের দাবীকে ন্যায্যতা দিয়ে এবং বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ হিসেবে

জোরের সঙ্গে স্বীকার করেও নিজেদেরকে শেকড়হীন মনে করেছেন তাঁরা।

অভিবাসী সাহিত্য অভিবাসী মানুষের দ্বারাই। একই কথা victim diaspora সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেশভাগ বিষয়ক সকল কথাসাহিত্যকে ভিকটিম ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলা যায় না। উদ্বাস্তু মানুষদের স্মৃতিকথাই কেবল বিতাড়িত অভিবাসী সাহিত্যের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। উপন্যাস-ছোটগল্প-স্মৃতিকথার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা দেশভাগের সাহিত্যের একটি ভাগ স্মৃতিকথাগুলি। আবার বিতাড়িত অভিবাসী চেতনা অথবা উদ্বাস্তু মনস্তত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রেও বহুমাত্রিকতার বৈচিত্র্য রয়েছে স্মৃতিকথাগুলিতে। দেশভাগের সাহিত্য হিসেবে এবং বিতাড়িত অভিবাসী চেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে স্মৃতিকথাগুলি তাই নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

৭) উপসংহার ঃ— এইভাবে স্মৃতিকথার মাধ্যমে দেশভাগের মত একটি প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকদশকব্যাপী দুই বঙ্গের বাঙালি মানসগঠন, সমাজ সংগঠন, সংস্কৃতির স্বরূপ ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে। বস্তুতঃ দেশভাগের হেতু হিসেবে নিছক মুসলমানদের বিভেদ-রাজনীতির একপেশে ধারণাকে ভেঙে দেয় এপার বাংলার বর্ণহিন্দুদের স্মৃতিচারণা। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দুদের স্মৃতিকথায় গোপন থাকেনি এবং দেশভাগের পরেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবাহিত থেকেছে পশ্চিমবাংলার সমাজ-মানসে এবং সেইকারণেই দেশভাগের ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে, এমনকি একবিংশ শতকেও স্মরণকর্তার স্মৃতিচারণা নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

তবে সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রমণের ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল জাতীয়বাদী আদর্শ এবং অবশ্যই মার্ক্সবাদী চিন্তা-চেতনা। যদিও এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রমণের চেষ্টা সমাজ-মানসের মূল অসুখটিকে এড়িয়ে গিয়ে আদর্শবাদী হয়ে উঠতে চেয়েছে। বস্তুতঃ দেশভাগ নিয়ে একপ্রকার নীরবতা পালন করেছে দেশভাগের পরবর্তী দুই-দশকের বাঙালি সংস্কৃতি।

অধুনা বাংলাদেশের অধিবাসী মুসলমান ধর্মের মানুষদের স্মৃতিচারণা থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সমান্তরাল অথচ তাদের থেকে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তবে একথা ঠিক

দেশভাগ ও দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব সংশয়ও তাঁদের বয়ানে ধরা পড়েছে। বস্তুতঃ দেশভাগকে দুঃখের অথবা আনন্দের — কিভাবে মনে রাখবেন বাংলাদেশের বাঙালিরা — সে বিষয়ে তাঁদের কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

দেশভাগের অভিঘাত ওপার বাংলার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর এবং এপার বাংলার নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের উপর ছিল ভয়াবহ ও নিষ্করুণ। পাকিস্তানী আমলে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারের দায় পালনের স্পষ্ট অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকথাতে ধরা আছে। এপার বাংলায় নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ক্রমশঃ যে একটি রাজনৈতিক রূপ পেয়েছে — তাঁদের স্মৃতির ভাষ্যে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রাক্-বিভাজন পর্বে বাঙালি হিন্দুসমাজে যাঁরা প্রান্তীয় ও দরিদ্র ছিলেন, দেশভাগের পরে স্বাধীন সার্বভৌম দেশেও তাঁদের প্রান্তীয় অবস্থার কোনরকম পরিবর্তন হয়নি।

দেশভাগ নিয়ে নারীর স্মৃতিকথা একটি সদর্থক সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। পরিবারে ও সমাজে, ব্যক্তিগত এমনকি অর্থনৈতিক বিষয়েও নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথাও স্মৃতিকথার মাধ্যমে জানা যায়।

দেশভাগকে রাজনৈতিক ভাগাভাগির সঙ্গে মনের ভাগাভাগিও বলা যায় কিনা — এ বিষয়ে যথাযথ উত্তর স্মৃতিকথাগুলি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে পূর্ববাংলায় যখন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হ'ল, অর্থাৎ বাংলাভাষাভাষীদের জন্য নিজস্ব দেশ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যে সময় থেকে প্রকট হয়ে উঠল, সেই সময় থেকেই দেখবো, এপার বাংলায় দেশভাগ-কেন্দ্রিক স্মৃতিকথা বাঙালি সমাজে নতুন আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। বাংলাদেশেও দেশভাগ নিয়ে মুক্ত বক্তব্য প্রকাশের পরিসর তৈরী হয়েছে। শাশ্বত বাঙালি সত্তা অন্বেষণের নাগরিক প্রচেষ্টাসমূহের উল্লেখও পাওয়া যায় স্মৃতিকথাগুলিতে।

এই গবেষণাকর্মটি মূলতঃ সাহিত্য কেন্দ্রিক, তবে ইতিহাসকে বাদ নিয়ে নয়। দুই বাংলার সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের স্মৃতি দেশভাগকে কেন্দ্র করে কেমনভাবে গড়ে উঠেছে এবং সেই সকল স্মৃতির কোন বিপ্রতীপ অবস্থান রয়েছে কিনা প্রভৃতি জরুরী আলোচনা এই গবেষণাকর্মে

প্রাধান্য পেয়েছে। গবেষণাকর্মটি একান্তই মৌলিক এবং দেশভাগ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটাবে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র

1. Gyanendra Pandey, *Remembering Partition,* Cambridge University Press, Cambridge, 2001, P-11

প্রাধান্য পেয়েছে। গবেষণাকর্মটি একান্তই মৌলিক এবং দেশভাগ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটাবে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র

1. Gyanendra Pandey, *Remembering Partition,* Cambridge University Press, Cambridge, 2001, P-11

17-12-2022

17-12-2022

DR. SOUMITRA BASU
Sisir Kumar Bhaduri Professor
[illegible], Dept. of Drama
Rabindra Bharati University